প্রসঙ্গ : দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়

শাহ মো. জিয়াউদ্দিন

| ঢাকা , রোববার, ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৯

বাংলাদেশে একটি প্রচলিত প্রবাদ আছে, গায়ে মানে না আপনি মোড়ল। এ প্রবাদটি প্রচলিত রয়েছে দেশের প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে শুরু করে মহানগর পর্যন্ত। বাংলাদেশের প্রচলিত এ প্রবাদটির যথার্থতা খুঁজে পাওয়া যায় দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আহংবোধের মধ্যে। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে গুটি কয়েক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অহংবোধ দেখে মনে হয় তারাই শ্রেষ্ঠ। দেশের অভ্যন্তরে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের লড়াই করতে করতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাই দেশের শিক্ষাব্যবস্থার বারোটা বাজিয়েছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এ হীন মানসিকতার প্রভাব পড়ছে ছাত্রদের ওপর। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়ারাই পড়াশোনা শেষ করে দেশের বিভিন্ন দফতরে দায়িত্ব পালন করে। তাই দেখা যায় এরাই এখন নানা অনৈতিক কাজে জড়িয়ে পড়ছে। দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়নরত ছাত্রদের মধ্যে যে দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়ছে এর জন্যও এ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাই দায়ী।

দেশের বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এত অহংবোধ কেন? তারা জ্ঞানী এ জন্য অহংবোধ না প্রাচীন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক এ কারণে অহংবোধ? কোনটা সঠিক? তবে দেখা যায় প্রাচীন প্রতিষ্ঠান হিসাবেই তাদের এ অহংবোধ। এ শিক্ষকদের অনেকেই নিজেদের বিশ্বমানের শিক্ষক মনে করেন তাই তাদের এত অহংবোধ। বাস্তব অবস্থা নিরীক্ষণ করলে কি তা দেখা যায়? দেখা যায় তারা অন্তঃসারশূন্য। সম্প্রতি আন্তর্জাতিকভাবে বিশ্বের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের মানের ক্রমানুসারে একটি তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। এ তালিকায় ১০০০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রমমানের তালিকায় বাংলাদেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম নাই। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের ৩৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম রয়েছে ওই ১০০০টি ক্রম অনুসারে প্রকাশিত তালিকার মধ্যে। যদি এ বছরের তালিকায় ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মান গত বছরের চেয়ে কমেছে। গত বছর ৩০০টির মধ্যে নাম ছিল ভারতের বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের। পাকিস্তানের মতো একটি উগ্রবাদী দেশেরও সাতটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম আছে ১০০০টির মধ্যে। অথচ বাংলাদেশের নাম নেই তারপরও দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এত অহংবোধ কি কারণে। বিশ্বমানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্ধারণের মানদন্ডে ১০০০টির মধ্যে যারা নিজেদের অবস্থান ধরে রাখতে পারে না, তাদের অহবোধ মানায় না। তাদের লজ্জা থাকা উচিত। দেশের শিক্ষা বাজেটের আনুপাতিক হারে একটি

বড় অংশ ভোগ করেন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। এর বিনিময়ে দেশের শিক্ষার্থীদের তারা কি শিক্ষা দিচ্ছেন তা আজ দেখার বিষয়। দেশের অভ্যন্তরে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে যে পরশ্রীকাতরতা বিরাজ করছে, তা দেখে দেশের বিবেকবান মানুষেরা অবাক হয়ে যায়। দেশের অভ্যন্তরে এক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চেয়ে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করতে ব্যস্ত। এর ফলে মূল শিক্ষার কাজ করার সময় তাদের নাই। এ ধরনের পরশ্রীকাতরতার প্রভাবটা আজ সারা দেশের শিক্ষাঙ্গনে ছড়িয়ে পড়েছে ফলে দক্ষ ও নৈতিকতা সম্পন্ন মানব সম্পদ সৃষ্টি হচ্ছে না। অথচ এই পরশ্রীকাতর শিক্ষকগুলোই নিজেদের দেশের শ্রেষ্ঠ বিবেকান নৈতিকতা সম্পন্ন বুদ্ধিজীবী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছে।

বাংলাদেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দেখভাল করার জন্য সরকারের রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন। সম্প্রতি সরকার দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য মঞ্জুরি কমিশন কিছু অভিন্ন নীতি প্রণয়নের পদক্ষেপ নিয়েছেন। মঞ্জুরি কমিশনের এ ধরনের পদক্ষেপ কয়েকটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ইগোতে লেগেছে। এই শিক্ষকরা সরকারের গৃহীত নীতিতে ঘোর আপত্তি জানিয়েছেন। মঞ্জুরি কমিশনের নীতি বাতিল করা না হলে অহংবোধধারী শিক্ষকরা আন্দোলনে নামবেন বলে ঘোষণা

দিয়েছেন। এই অহংবোধকারী শিক্ষকরা নিজেদের দেশের অন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে দাবিদার। যারা বিশ্বের এক হাজারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় অবস্থান করতে পারে না তারা কি করে নিজেদের শ্রেষ্ঠ বলে দাবি করে, একটু লজ্জাও লাগে না তাদের। এদেরই বলে গায়ে মানে না আপনি মোড়ল। দেশের গুলো কি শুধু নামেই বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে যখন মানদন্ডে যাচাই করার হয়, তখন এদের অবস্থান অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও খুঁজে পাওয়া যায় না। অপরদিকে দেশের অভ্যন্তরে এদেরই কথিত জ্ঞানের ফুটানি দেখে দেশের মানুষ তটস্থ। মঞ্জুজরি কমিশন দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ, পদোন্নতি বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করবেন এ রকম সিদ্ধান্তে তাদের গাত্রদাহ শুরু হয়েছে। এর ফলে নাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন ক্ষুণœ হবে। দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কি সেই অবস্থা বর্তমানে আছে। বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৩ সালে একটি অধ্যাদেশ জারি করেন, দেশের ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য, সেই ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয় হলো, ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, জাহাঙ্গীরনগর, বুয়েট, বাকৃবি । যে অধ্যাদেশটি ছিল তক্ষশীলা (নালন্দা) বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে অনেকটা। বর্তমানে দেশে পাবিলিক বিশ্ববিদ্যালয় বেড়েছে। তবে নতুন স্থাপিত অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশের আওতাধীন পরিচালিত হয় না। উল্লেখিত ছয়টি

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় বাদে অন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন অধ্যাদেশ। একই দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের অধ্যাদেশে পরিচালিত হবে এটাও ভালো নয়। ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশ উল্লেখিত ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে কতটুকু পালন করে থাকে? তাও যাচাই করে দেখা দরকার? নিয়োগ ব্যবস্থাটা মঞ্জুরি কমিশনের হাতে চলে গেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের ক্ষতি হবে নাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ বাণিজ্যটা কমে যাবে? সাধারণ মানুষের মনে এ ধরনের প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। মূলত নিয়োগ বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাবে যার জন্যই তাদের এ সংক্ষুব্ধতা। পবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগের বিষয়টি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখা গছে যে, একজন শিক্ষার্থী মেধাবী এবং ভালো রেজাল্টও করেছে কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালীন সময়ে বিশেষ ছাত্র সংগঠন করার অজুহাতে তিনি শিক্ষক হতে পারেন নাই। তার চেয়ে কম মেধা ও যোগ্যতাসম্পন্ন অন্যজন বিশেষ সুবিধায় অগ্রাধিকার পেয়ে শিক্ষক হয়ে গেছেন। এমন ঘটনা ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশে পরিচালিত ছয়টি বিশ্বদ্যিালয়ের শিক্ষক নিযোগ পর্যবেক্ষণ করলে ভুরি ভুরি পাওয়া যাবে। উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশটি উল্লেখিত ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ে কতটা মানা হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সরকারি দলের তল্পিবাহক শিক্ষকরাই উপচার্য হয়ে থাকেন। এমনও শোনা যায়,

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপচার্য হওয়ার জন্য কোন কোন শিক্ষক ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার ছাত্রনেতাদের তেল মেরেছেন। আর এই তেল মারার জন্যই ক্ষমতাসীন ছাত্র সংগঠনের নেতারা হয়ে উঠেছে আজকে এত বেপরোয়া। প্রত্যেক সরকারের আমলেই ক্ষমতাসীন ছাত্র সংগঠনের ছাত্রনেতারা এতটা বেপরোয়া হওয়ার নেপথ্যে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের চেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাই বেশি দায়ী। মঞ্জুজরি কমিশনের কাছে নিয়োগ বদলিসহ কিছু ক্ষমতা চলে গেলে ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশটি ক্ষুণœ হয়ে যাবে বলে যে শিক্ষকরা আন্দোলনে মাঠে নেমেছেন, তাদের কাছে প্রশ্ন, কেন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সংসদ নির্বাচন নিয়মিত হয় না? কেন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গণতান্ত্রিকভাবে সিনেট গঠিত হয় না? রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট নির্বাচনসহ অনান্য গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াগুলো কি যথাযথভাবে পালিত হয় উল্লেখিত ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ে? যদি না হয় সেই বিষয়গুলো যথাযথভাবে পালন করার দাবিতে শিক্ষকদের তো আন্দোলন করতে মাঠে দেখা যায় না? জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্প্রতি ঘটনাটির জন্য দায়ী করে? ছাত্ররা না শিক্ষকরা? বিষয়টি নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ করলে মূল কারণ উদঘাটিত হয়ে যাবে। এর জন্য দায়ী শিক্ষকরাই। দেশে কথিত নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এখন চলছে সান্ধ্যকালীন পড়ানোর রমরমা বাণিজ্য। এ বাণিজ্যটা কতটা নৈতিক? কারণ

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কাঠামোগত শিক্ষণ পদ্ধতি আবাসিক। প্রায়শই শোনা যায়, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস না নিয়ে চলে যাচ্ছেন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নিতে। শিক্ষকদের এ ধরনের অনৈতিকতার প্রভাবটা ছাত্রদের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিকভাবে ছড়িয়ে পড়ে । ফলে দুর্নীতির আচ্ছাদনে ঢাকা পড়ছে দেশ। কারণ মানব সম্পদ নৈতিক ভাবে গড়ে তোলার দায়িত্ব শিক্ষকদের আর এই শিক্ষরা যদি নানা দুর্নীতি এবং অনৈতিক কাজে জড়িত থাকেন, তাহলে নৈতিকতা সম্পন্ন মানবসম্পদ সৃষ্টি হবে কীভাবে। দেশে প্রশাসনসহ বিভিন্ন বিভাগে যে দুর্নীতি এবং অনৈতিকতার কথা শোনা যায় তা দেশের উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রবাহমান দুর্নীতির এবং অনিয়মের একটি ফসল। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে একজন শিক্ষার্থী শুধু মাত্র সিলেবাস গলধঃকরণ করেন না, সেখান থেকে বাহ্যিক এবং প্রশাসনিক কিছু বিষয় ও সিলেবাসবহির্ভূত নৈতিক বিষয়গুলিও শেখেন। যা পরবর্তী জীবনে শিক্ষার্থীর মনে প্রোথিত হয়ে থাকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চিরকুট নামক একটি বিষয় উঠে এসেছে গণমাধ্যমে। তার জন্য ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনকে দায়ী করা হয়েছে। একজন শিক্ষার্থী কি করে চিরকুট প্রদানের মাধ্যমে ভর্তি বাণিজ্য করার সাহস পায়, এর নেপথ্যে যদি কোন শক্তির আধার না থাকে। শিক্ষকরা শুনেন বলেই শিক্ষার্থীরা চিরকুট দেয়ার সাহস পায়। শিক্ষকদেরই এ কেমন নৈতিকতা

তারা এ ধরনের চিরকুটকে মেনে নেন। এ ধরনের পরিস্থিতিতে শিক্ষকদের প্রতিবাদী হওয়ার কথা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের মুক্তি এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের বাতিঘর হিসাবে চিহ্নিত করলে ভুল হবে না । অথচ এই প্রতিষ্ঠানটি অনৈতিকতার বেড়াজালে দিন দিন জড়িয়ে পড়ছে। দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে বর্তমানে চলছে এক ধরনের ইগো প্রবলেম। নিজেদের ইগো লালন করতে গিয়ে আন্তর্জাতিক মানের প্রতিযোগিতা থেকে ক্রমেই দূরে সরে পড়ছে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হলো দেশের মানবসম্পদ তৈরির সুতিকাগার। সারা দেশের দুর্নীতি ও অনৈতিকতা হ্রাস করতে হলে সর্বাগ্রে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে করতে হবে কলুষমুক্ত। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকেই অন্য সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুলো শেখে। সরকারের উচিত দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ ইউজিসিকে দেয়া। ইউজিসির মাধ্যমে দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যমান অনিয়ম, দুর্নীতি রোধ করা। কোন বিশ্ববিদ্যালয়কে একক মোড়ল হিসাবে চিহ্নিত না করে সবাইকে সমান দৃষ্টিতে দেখা।

[লেখক : কলামিস্ট]